তাফসীর সূরা আত তাকাসুর

*ডঃ আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস**

সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। এবং তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা) এর ওপর বর্ষিত হোক শান্তি ও কল্যাণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারাই সত্যের পথ অবলম্বন করবে তাদের ওপর (শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক)।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রখ্যাত সাহাবী তারজুমানুল কুরআন ইবন আব্বাস (রা) এর মতানুযায়ী সূরা আত তাকাসুর মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

এই সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতিকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন মানুষের জীবনের যে সাধারণ লক্ষ্য - অর্থাৎ সম্পদ আহরণ - তা থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে মুমিনদের জন্য জীবনের যথার্থ লক্ষ্য যা হওয়া উচিৎ - যা কিনা আমাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য - অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ এবং ইবাদত - সেদিকে মনোনিবেশ করার। এ সূরার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু হাদীস রয়েছে।

বুখারী শরীফের একটি হাদীস অনুযায়ী, আল্লাহর রাসূল (সা) ভবিষ্যত সম্পর্কে মুসলিমদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: "আল্লাহর শপথ! আমি এ ভয় করি না যে তোমরা দরিদ্র হয়ে পড়বে। (উল্লেখযোগ্য সে সময় আল্লাহর রাসূলের (সা) অধিকাংশ সাহাবীই দরিদ্র ছিলেন) আমি ভয় করি যে তোমাদেরকে দুনিয়াবী সম্পদ দেয়া হবে প্রচুর পরিমাণে, যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে দেয়া হয়েছিল, এবং তোমরা এর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করবে যেমনটি তারা করেছিল, অতঃপর তাদের মত তোমাদেরকেও তা (সঠিক পথ থেকে) দূরে সরিয়ে দেবে।" - তাই মুসলিমদের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) ভয় ছিল এ ব্যাপারে যে, মুসলিমরা পার্থিব ধনসম্পদ লাভ করবে এবং তা তাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় বিপথে নিয়ে যাবে।

অপর একটি হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন তাঁর সাহাবীদেরকে প্রশ্ন করলেন "তোমাদের মধ্যে কেউ কি দৈনিক কুরআনের এক হাজারটি আয়াত তিলাওয়াত করতে সক্ষম নয়?" এবং সাহাবীদের মাঝে একজন বলে উঠলেন: "আমাদের মাঝে কে আছে যে দৈনিক কুরআনের হাজারটি আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি 'আলহাকুমুত তাকাসুর' তিলাওয়াত করতে সক্ষম নয়?" এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে গভীর চিন্তাভাবনা সহকারে সূরা আত তাকাসুর একবার তিলাওয়াতের (শুধু না বুঝে মুখস্থ বলে যাওয়া নয়) সওয়াব কুরআনের হাজারটি আয়াত তিলাওয়াতের সওয়াবের সমতুল্য। এ থেকে বোঝা যায় যে কুরআনের প্রায় এক হাজার আয়াতে বিভিন্নভাবে সেই সমস্ত বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো সূরা আত তাকাসুরে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপর এক সাহাবী বর্ণনা করেন যে তিনি একদিন আল্লাহর রাসূল (সা) এর নিকট আসলেন যখন তিনি সূরা আত তাকাসুর তিলাওয়াত করছিলেন, এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: "মানুষ বলে: আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। কিন্তু হে আদম সন্তান, কোন সম্পদই কি তোমার সেটুকু ছাড়া, যতটুকু তুমি খেয়েছ, ব্যবহার করেছ, পরিধান করে নষ্ট করে ফেলেছ, আর যা তুমি সাদকা করেছ এবং এর দ্বারা একে স্থায়িত্ব দিয়েছ?" মানুষের সব সম্পদ এই দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত, যা মানুষ খরচ করে ফেলে, আর এরপর তা তার আর কোন কাজে আসে না, কিংবা যা সে সাদকা করে, ফলে তা (তার প্রতিদান, অনেকগুণ বর্ধিত আকারে) তার জন্য রয়ে যায় এমনকি মৃত্যুর পরেও।

<u>সূরা আত তাকাসুর, আয়াত - ১:</u> **"আল হাকুমুত তাকাসুর"** *ভাবার্থ:* **"সম্পদ আহরণ তোমাদেরকে বিক্ষিপ্ত (গাফিল) করে রাখে।"** *- মানুষ তার জীবনের জাগ্রত সময়ের অধিকাংশই ব্যয় করে সম্পদ আহরণে, এই বাস্তবতার মাঝেই আমরা বাস করছি। আমরা যতই আত্মিক উন্নতি লাভ করতে চাই না কেন আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয় হয় সম্পদাহরণে। এখানে সম্পদ বলতে শুধু টাকা-পয়সা বোঝানো হয় নি, বরং তা অন্য প্রকারও হতে পারে, যেমন: সন্তান-সন্ততি। কেননা অধিক সন্তান-সন্ততি থাকা মানে সমাজে অধিকতর শক্তিশালী অবস্থান - সমাজে অনেকেই তাদের সন্তান-সন্ততির বড়াই করে থাকে। যদিও বর্তমান যুগে এই ধারণাটি বদলে গেছে পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রভাবে, যেখানে পশ্চিমে মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবার ছোট রাখার পক্ষপাতি, এবং তারা মুসলিমদেরকেও এই ধোঁকায় ফেলছে যে অধিক সন্তান-*

সন্ততি হলে তাদের ভরণ-পোষণ করা সম্ভব হবে না, ফলে মুসলিমরাও তাদের বংশবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) উপদেশ দিয়েছেন: "তোমরা বিয়ে কর এবং অধিক সন্তান লাভ কর।" যাহোক সাধারণভাবে ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি মানুষের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য এবং অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, এবং মানুষ যথাসম্ভব সম্পদাহরণে সচেষ্ট হয় কেননা তা বিভিন্নভাবে তাদের জীবনকে উপভোগ্য করে তোলে। বর্তমান সমাজের সাধারণ চিত্র হচ্ছে এই যে পরিবারের কর্তা সারাদিন ঘরের বাইরে অবস্থান করবেন, তার কর্মক্ষেত্র থেকে সম্পদ আহরণের জন্য, আর কর্ত্রী ঘরে অবস্থান করে সেই সম্পদকে ব্যয় করবেন এবং তিনিও তা জমা করবেন ঘরে সঞ্চিত বিভিন্ন ভোগ্য বস্তুর আকারে - নতুন এটা, নতুন ওটা, বছর বছর ঘরে নতুন পর্দা, নতুন সোফা ইত্যাদি - কখনও পরিতৃপ্ত না হয়ে আরও বেশী করে সম্পদ জমা করতে থাকা। উভয়পক্ষেই চলে এই সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া, পুরুষ ঘরের বাইরে থেকে সম্পদাহরণে ব্যস্ত, আর নারী ঘরের ভেতর বিভিন্ন ভোগ্য পণ্যের আকারে সেই সম্পদকে জমা করতে সক্রিয়। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আনফালের ২৮ নং আয়াতে আমাদেরকে সাবধান করছেন:

"আর জেনে রাখ, তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা বৈ নয়, আর নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার (যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের জন্য)।" (সূরা আল আনফাল, ৮ : ২৮)

আল্লাহ এখানে আমাদের সামনে সম্পদ এবং সন্তানের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছেন - এ সবই আমাদের জন্য পরীক্ষা, এগুলোর সাহায্যে আমাদেরকে শুধুই পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা পৃথিবীতে এসেছি এগুলো না নিয়ে, আবার পৃথিবী থেকে বিদায়ও নেব এগুলো না নিয়েই। সুতরাং ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির প্রতি আমাদের বাসনা যেন আমাদেরকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে না পারে - এ কথা জানা যে আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত, এবং এর দ্বারা তাঁকে স্মরণ করা। আল্লাহ পাক পুনরায় সূরা আল মুনাফিকুনের ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত না করে, এবং যারা এমনটি করবে (সম্পদ ও সন্তান সন্ততির দ্বারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিক্ষিপ্ত হবে), তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা আল মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯)

- যারা সম্পদাহরণ ও সন্তানের প্রতি তাদের বাসনার কারণে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত হল, তারা প্রকৃতপক্ষেই তাদের জীবনের মূল লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলল। আল্লাহ পাক বলেন:

"সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে...।" (সূরা আল আসর, ১০৩:১-৩)

- অর্থাৎ তারাই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হবে না যারা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। কিন্তু আমরা যদি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং ধারাকে হারিয়ে ফেলি এবং আল্লাহকে স্মরণ না করি, তার অর্থ হচ্ছে শয়তান আমাদেরকে কব্জা করে ফেলেছে এবং আমরা শয়তানের দাসে পরিণত হয়েছি, আমাদের নিজেদের কামনা-বাসনার দাসে পরিণত হয়েছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"তুমি কি তাকে দেখনি যে তার প্রবৃত্তিকে তার দেবতা বানিয়েছে?" (সূরা আল ফুরকান, ২৫ : ৪৩)

এটা এমন অবস্থা যখন একজন মানুষ তার বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করে, প্রাচুর্যের বাসনা তার ইলাহতে পরিণত হয়। আর সম্পদের প্রতি এই বাসনা অনির্বাণ, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যদি আদম সন্তানকে স্বর্ণের একটি উপত্যকা দেয়া হয়, সে আরেকটি চাইবে। শুধুমাত্র যে জিনিসটি তার মুখ পূর্ণ করতে পারবে, তা হল তার কবরের মাটি।" - এই কবরের মাটিই কেবল তাকে নিরস্ত করতে পারে, এর পূর্ব পর্যন্ত সে যতই পাবে, ততই সে চাইতে থাকবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন "দীনার এবং দিরহামের দাস সর্বদাই দুর্দশাগ্রস্ত থাকবে।" তাদের জীবন হবে দুর্বিষহ। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন, আমরা যেন এমনটি হতে না দেই। যদিও আমাদের

চারপাশে আমরা তাদেরকে দেখতে পারব যারা ঐশ্বর্যে আমাদের থেকে সমৃদ্ধশালী। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্টত: জানিয়ে দিচ্ছেন:

"আল্লাহ তোমাদের মাঝে কতককে রিযিকের ব্যাপারে কতকের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।" (সূরা আন নাহল, ১৬:৭১)

এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন কোন মানুষ অন্যদের থেকে অধিক লাভ করবে। এবং তিনি আমাদেরকে আরও বলেছেন:

"তোমরা সে জিনিসের কামনা কোর না যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কাউকে অন্যদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন।" (সূরা আন নিসা, ৪:৩২)

কেন নয়? কারণ এই প্রাধান্য দেয়া একটি পরীক্ষা। তিনি কাউকে তোমার চেয়ে বেশী দিয়েছেন, তিনি যদি তোমাকে তা দেন যা অন্যকে দিয়েছেন, তবে তা তোমার জন্য মাত্রাতিরিক্ত হবে (তুমি সীমা লংঘন করবে), তিনি ততটুকুই তোমাকে দিয়েছেন যতটুকু তোমার জন্য ভাল।

তিনি সবাইকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী রিযিক বন্টন করেছেন, এবং আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন:

"তিনি কোন নফসের ওপর সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না।" (সূরা বাক্বারাহ, ২:২৮৬)

সুতরাং প্রত্যেকেই ততটুকু পাবে যতটুকু তার জন্য যথার্থ। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যারা তোমার ওপরে অবস্থান করছে, তাদের দিকে তাকিও না, তাদের দিকে তাকাও যারা তোমার নীচে রয়েছে।" কেননা কেউ যদি তার চেয়ে হতভাগ্যদের দিকে তাকায়, তখন সে তার নিজের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহ দেখতে পাবে এবং কৃতজ্ঞ হবে। কিন্তু কেউ যদি সবসময় তার চেয়ে বেশী সৌভাগ্যবানদেরকে লক্ষ্য করে, তাহলে তার মনে হবে "আমি কেন বঞ্চিত হলাম?" এ অবস্থায় মানুষ কখনও সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, সে সর্বদা বিচলিত, হতাশ, চিন্তিত ও ব্যস্ত থাকে অধিক আহরণের জন্য। এমনকি সম্পদ হাতে আসার পরও এমন লোক ভীত থাকে যে কখন আবার তা নিঃশেষ হয়ে যায়, সে চারপাশের মানুষকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, এই বুঝি কেউ তার সম্পদ হ্রাস করতে এল। কাউকে যদি সে তার সাথে হাসিমুখে কথা বলতে দেখে, তবে সে ধারণা করে, এ বোধহয় আমার কাছে কিছু চাইতে এসেছে। এভাবে তারা জীবনের খুব সরল বিষয়গুলো থেকে সহজতম আনন্দও নিতে পারে না। সবকিছুই তাদের কাছে অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়ায়, তাদের অন্তর কখনই স্থিতি লাভ করতে পারে না, কেননা তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার স্মরণ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: "কেবলমাত্র আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।" তাই যদি আমরা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাই, তবে আমরা কিছুতেই অন্তরে প্রশান্তি ও বিশ্রাম লাভ করতে পারব না। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"তাদের সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে চমৎকৃত না করে..." (সূরা আত তাওবা, ৯ : ৫৫)

এখানে কাফির, পথভ্রষ্টদের কথা বলা হচ্ছে, তাদের অর্জন যেন তোমাকে চমৎকৃত না করে। কেননা

"...আল্লাহর পরিকল্পনা হচ্ছে তাদেরকে দুনিয়ার এসমস্ত জিনিস দ্বারা শাস্তি দেয়া, যেন তাদের জান এ অবস্থায় কবয করা হয় যে তারা অবিশ্বাসী।" (সূরা আত তাওবা, ৯ : ৫৫)

কেননা তারা যখন সীমা-লংঘন করা সত্ত্বেও আরও বেশী করে সম্পদ লাভ করে, তখন তারা উৎফুল্ল হয় এই ভেবে যে আমরা খুব ভাল-ভাল কাজই করছি, সবই ঠিকমত চলছে, তখন তাদের সীমা-লংঘন আরও বেড়ে যায়, কিন্তু এটা প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য শাস্তি, কেননা আরও বেশী সম্পদ লাভ করার কারণে তারা কখনও তাদের ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করবে না, কারণ যখন সম্পদের ক্ষতি হয়, তখন একজন মানুষ এ চিন্তা করার অবকাশ পায়, যে তার হয়ত এভাবে সম্পদের পেছনে ছোটা উচিৎ নয়, বিশেষতঃ যখন তা এত সহজেই হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাকে যদি আল্লাহ দিতেই

থাকেন, তবে কখনও সে ফিরে আসবে না এবং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের মাঝে তোমাদের জন্য শত্রু রয়েছে, অতঃপর তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও।" এখানে তাদেরকে সাধারণভাবে শত্রু বলা হয়নি, কিন্তু আমরা যদি তাদের সাথে সেভাবে আচরণ করতে ব্যর্থ হই যেভাবে আল্লাহ চান, তবে তারা আমাদের শত্রুতে পরিণত হয়। যেমন কারও স্ত্রী যদি সাজসজ্জা করে এবং সুগন্ধী মেখে বেড়াতে যেতে চায়, অথচ সে ব্যক্তি জানে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যে মহিলা সুগন্ধী ছড়িয়ে বাইরে যায়, সে একজন যিনাকারী, যতক্ষণ না সে ঘরে ফিরে আসে।", কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার কারণে তাকে বাধা দিতে চায় না এবং এভাবে তাকে ঘরের বাইরে যেতে দেয়, এ অবস্থায় এই স্ত্রী তার শত্রুতে পরিণত হয়, কারণ এই স্ত্রী তাকে আল্লাহর আদেশ পালন থেকে বিরত রেখে আখিরাতে শাস্তির উপযুক্ত করে তুলল। কারণ এ কাজের জন্য এই ব্যক্তিকে আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে, রাসূল (সা) বলেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল, এবং প্রত্যেককে সে যার রাখাল (অর্থাৎ যারা বা যা কিছু তার ক্ষমতাধীন ও অধীনস্থ) তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" সুতরাং এই ক্ষেত্রে এই স্ত্রী তার পাপের জন্য শাস্তির যোগ্য, এবং এই স্বামী তার অধীনে তার স্ত্রীকে এ কাজ করতে দেয়ার জন্য শাস্তির যোগ্য, এভাবে তার স্ত্রী প্রকৃতপক্ষে তার শত্রুতে পরিণত হল। একইভাবে ধরা যাক সন্তানরা তাদের জন্মদিন করতে চাচ্ছে, এবং তারা তাদের বাবার মন গলানোর জন্য বলছে, যে আমার বন্ধুদের জন্মদিন হয়, অমুকের জন্মদিন হয়, আমি কেন করতে পারব না, অথচ আপনি জানেন যে জন্মদিন পালন করা ইসলামে নিষিদ্ধ কেননা এই অনুষ্ঠানের মূল প্রোথিত পৌত্তলিকতায়। আপনি যদি স্নেহপরবশ হয়ে আপনার সন্তানদেরকে জন্মদিন পালন করার অনুমতি দেন, তাহলে এই সন্তানরা আপনার শত্রুতে পরিণত হল কেননা আপনাকে তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত করে দিল। এখানে প্রকৃতপক্ষে যে অবস্থাটি তৈরী হয়েছে, তা হল আপনার স্ত্রী-সন্তানের প্রতি আপনার ভালবাসা আল্লাহর প্রতি আপনার ভালবাসাকে ছাড়িয়ে গেছে, ফলে আপনি ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক করতে শুরু করেছেন। তাওহীদের দাবী এটাই যে আমরা কোন মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কোন আদেশ অমান্য করব না।

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত - ২: **"হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির"** *অর্থ:* **"যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।"** *অর্থাৎ বিভিন্নভাবে সম্পদ আহরণের পেছনে সাধনা তোমাদেরকে ব্যস্ত রাখে একেবারে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। সূরা আনআমের ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:*

"অতএব যখন তারা সতর্কবাণী ভুলে গেল, যার দ্বারা তাদেরকে স্মরণ করানো হয়েছিল, আমরা তাদের জন্য প্রতিটি (উপভোগ্য) বস্তুর দরজা খুলে দিলাম, যতক্ষণ না তারা এই ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ল এবং হঠাৎ এর মাঝে আমি তাদেরকে ছিনিয়ে নিলাম (মৃত্যু ঘটিয়ে দিয়ে শাস্তিতে নিক্ষেপ করলাম)..." (সূরা আল আনআম, ৬ : ৪৪)

তাদের এই পরিণতি এজন্য যে তারা সম্পদের দ্বারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার উপদেশকে ভুলে গিয়ে শয়তানের কব্জার মধ্যে চলে যায়, এবং আল্লাহ তাদেরকে যাবতীয় পার্থিব সম্পদ দান করতে থাকেন, এবং তাদের এই ভোগ-বিলাসের মধ্যস্থলে হঠাৎ তাদের জান কবয করা হয় এ অবস্থায় যে তারা কাফির। এভাবে যখন মৃত্যু আমাদেরকে স্পর্শ করে, আমরা উপলব্ধি করি যে, জীবিত অবস্থায় এ সবকিছুই ছিল আমাদের জন্য পরীক্ষামাত্র। এই জীবনে মানুষ সহজে বিভ্রান্ত হয় কেননা এখানে আমরা যা করছি, তার পরিণতি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এই পরিণতি আমরা কেবল জানতে পারি ওহীর মাধ্যমে। দৃশ্যত আমাদের মনে হয় যে একজন লোক ভাল কাজ করেও খারাপ পরিণতি বরণ করছে, অথচ অপর একজন খারাপ কাজ করেও পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করছে, বহু বড় বড় পাপাচারীকে দেখা যায় সম্পদ এবং সম্মানের স্তূপের ওপর অধিষ্ঠিত অবস্থায়। তাই কাজের পরিণতি আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট নয়। কেবল আল্লাহর নবীরাই আমাদেরকে কাজের প্রকৃত পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করেন যে, চূড়ান্ত পরিণতিতে আমাদের সবার কাজের হিসাব নেয়া হবে, এবং এ পৃথিবীতে সেটা না হলেও পরবর্তী জীবনে অবশ্যই তা হবে। তাই আল্লাহ যখন আমাদের এই সংবাদ দিচ্ছেন যে মানুষ তাদের সম্পদাহরণের প্রচেষ্টার জালে আটকে পড়ে থাকে মৃত্যুমুখে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত, তিনি আমাদেরকে এই উপদেশই দিচ্ছেন যে আমরা যেন সেই রাস্তায় না যাই। আমরা যেন এই অবস্থায় আটকে পড়ার আগেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করি। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা নিসার ১৮ নং আয়াতে বলেন:

"এবং তার তওবা কোন কাজে আসবে না যে খারাপ কাজ করতেই থাকে এবং যখন মৃত্যু তার সামনে উপস্থিত হয় তখন বলে: 'এখন আমি তওবা করছি।'..." (সূরা আন নিসা, ৪ : ১৮)

যদি মৃত্যুযন্ত্রণা একবার শুরু হয়ে যায়, এ অবস্থায় তওবা কবুল করা হবে না, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। বাস্তব কথা হচ্ছে আমরা জানি না যে মৃত্যু কখন হাজির হবে, এটা যেকোন মুহূর্তে হতে পারে। যদি আমরা সত্যিই না জানি যে মৃত্যু কখন আসবে আমরা কি আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন থাকার সাহস দেখাতে পারি? নিশ্চয়ই নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দার তওবা কবুল করবেন মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।" যে অবস্থায় একজন ব্যক্তি নিশ্চিত হয়ে যায় যে তার মৃত্যু উপস্থিত, এ অবস্থায় তার তওবা কবুল হবে না, আর আমরা কেউই জানিনা কখন আমার সে অবস্থাটি চলে আসবে। আমরা যদি জীবনের কোন এক সময় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শিখে থাকি, আর মৃত্যুর সময় যদি শিয়রে বহু লোক বসে এই কলেমা পড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে, তবুও একজন মৃত্যুপথযাত্রী এটা উচ্চারণ করতে পারবে এবং সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারবে, এর কোন নিশ্চয়তা নেই। এই নিশ্চয়তা লাভের একটিই উপায়, এখন থেকেই নিজের জন্য নেক কাজের জীবন বেছে নেয়া, সৎকর্মের পথে চলার জন্য এখনই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া - অর্থাৎ যেসব কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, সেগুলো করতে চেষ্টা করা, এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে - এমন কাজ পরিহার করতে সচেষ্ট হওয়া। কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

"এবং নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ কোন আত্মাকে অবকাশ দেন না, এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।" (সূরা আল মুনাফিকুন, ৬৩ : ১১)

আমাদের সকলের মৃত্যুর ক্ষণটি নির্ধারিত হয়ে আছে, আমরা একে এগোতেও পারব না, পিছাতেও পারব না, এটা নির্ধারিত, তবে কখন, তা আমাদের জানা নেই। এজন্য, মৃত্যু যেকোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে - এ বিশ্বাস নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। এর মানে এই নয় যে সবসময় মৃত্যুর ভয়ে দরজা আটকে ঘরে বসে থাকতে হবে, কেননা আল্লাহ পাক আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে মৃত্যু যথাসময়ে উপস্থিত হবেই, যদিও বা কেউ সুউচ্চ টাওয়ারে তার বিছানায় অবস্থান করে, তাহলেও মৃত্যু নির্ধারিত সময় হলে তার কাছে পৌঁছে যাবেই। তাই আমাদের জীবনকে অতিবাহিত করতে হবে, কিন্তু এ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে যে যেকোন সময়ে আমি মৃত্যুবরণ করতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালাম: **"...যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।"** *- কোন কোন পণ্ডিত এর ব্যাখ্যা এটা নিয়েছেন যে কিছু মানুষ তাদের কবরকে পর্যন্ত বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের প্রতীকে পরিণত করে থাকে - কবরের ওপর বিশাল সৌধ নির্মাণ করে ও এ নিয়ে গর্ববোধ করে থাকে। কেউ কেউ তাদের পারিবারিক কবরস্থান নিয়ে বড়াই করে যে কত সৌখিনভাবে একে সাজানো হয়েছে! এদের কাছে মৃত্যুর কোন অর্থ নেই, এরা মনে করে সম্পদ তাদেরকে চিরস্থায়ী করবে। আর তাই আমরা দেখতে পাই পৃথিবীতে সপ্তাশ্চর্যের একটি হচ্ছে তাজমহল। তাজমহলের বর্ণনায় দেখা যায় বাগাড়ম্বর এবং আবেগের প্রাচুর্য, সম্রাট শাহজাহান তার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন! এটা এমন ভালবাসা যা আপাদমস্তক আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা) কে আদেশ দিয়েছিলেন যে এক হাতের চেয়ে উঁচু কোন কবর পেলে তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে। এই ধরনের কাঠামো ইসলামে হারাম। অথচ একে মুসলিম স্থাপত্য এবং মুসলিমদের কীর্তির নিদর্শন বলে প্রচার করা হয়! কখনও নয়। বরং এটা মুসলিমদের অধঃপতন এবং মূর্খতার জলজ্যান্ত প্রতীক, সীমাহীন অজ্ঞতার পরিচয়! তারা কিভাবে এমন বিলাসবহুল একটি সৌধ নির্মাণ করতে পারল যা কিনা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনবে! তেমনি উল্লেখ করা যায় পাকিস্তানে জিন্নাহর কবরস্থানের কথা, যেখানে সুবিশাল সৌধ নির্মিত হয়েছে, অথচ পাকিস্তান শব্দের অর্থ: পবিত্র ভূমি, কিংবা পবিত্রদের ভূমি! এবং আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ দেশেই এরূপ নমুনা পাওয়া যাবে, এমনকি আমাদের বাপ-দাদাদের কবরেও কোন না কোন ধরণের কাঠামো খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়, তা ফলক, কিংবা ফুলের তোড়া কিংবা সাদা রং করা কবর - যে রূপেই হোক না কেন - এ সবই পৌত্তলিকদের রীতির অনুসরণ, যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কবরকে এর চারপাশের জমি থেকে মোটেই ভিন্ন দেখানো উচিৎ নয়।*

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত - ৩: **"কাল লা, সাওফা তা'লামুন"** *অর্থ:* **"কিন্তু শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।"** *অর্থাৎ সত্য হচ্ছে এই যে মৃত্যু অতি নিকটে, এই পার্থিব জীবনের বাস্তবতা তোমাদের কাছে শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের জুতার ফিতা থেকেও তার অধিক নিকটবর্তী, এবং জাহান্নামও।"*

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত - ৪: **"সুম্মা কাল লা সাওফা তা'লামুন"** *অর্থ:* **"এবং অতঃপর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।"** *এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একই কথা পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে এ ব্যাপারটিকে জোর দিচ্ছেন যে জীবনের বাস্তবতা বুঝতে পারার এই মুহূর্তটি অতি অতি নিকটে! যেমন আমরাও কোন কিছু জোর দিয়ে বলতে চাইলে দুবার বলে থাকি। কুরআনে কোন কোন আয়াত এভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বিশেষ জোর দেয়ার জন্য। কখনও কোন অতীব*

গুরুত্ববহ বক্তব্য বহনকারী আয়াতকে বিভিন্ন সূরায় পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, কখনও একই সূরার শুরুতে এবং শেষে আনা হয়েছে, কখনও পর পর আনা হয়েছে। মৃত্যুর ব্যাপারটি এত গুরুত্বপূর্ণ কারণ একবার কেউ কবরে শায়িত হয়ে গেলে তার বাকি জীবন কেবলই একের পর এক সত্যের উন্মোচন। তার কবর হয় জান্নাতের একটি বাগান, কিংবা একটি আগুনের বিছানা! আমাদের মৃত্যুর মুহূর্ত থেকেই আমাদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত - ৫: **"কাল লা লাও তা'লামুনা ইলমাল ইয়াকিন।"** *অর্থ:* **"যদি তোমরা নিশ্চিতভাবে জানতে!"** *যদি আমরা সত্যিই জানতাম এই পার্থিব জীবনের প্রকৃত রূপ, তাহলে আমরা যেভাবে জীবন যাপন করছি, সেভাবে জীবন যাপন করতাম না, আমাদের জীবন সম্পূর্ণ বদলে যেত। কিন্তু আমাদের যদি এই নিশ্চিত জ্ঞান থাকত, তাহলে এই জীবন পরীক্ষার বিষয় হত না, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইচ্ছা করেই আমাদেরকে সেই জ্ঞান দান করেন নি। এই জ্ঞান আমাদেরকে দেয়া হয়েছে ওহীর মাধ্যমে যা ধর্মগ্রন্থে এসেছে, এবং এক্ষেত্রে আমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, আমরা নবীদেরকে বিশ্বাস করতে পারি, নাও করতে পারি, ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করতে পারি বা অবিশ্বাস করতে পারি। যদি মুমিনদেরকে নিশ্চিত জ্ঞান দেয়া হত, তবে তারা কখনও পথভ্রষ্ট হত না, তারা ফেরেশতায় পরিণত হত। কিন্তু আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করতে চান, আর এ জীবন আমাদের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত এক পরীক্ষা মাত্র, আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, আমরা এই পরীক্ষা ক্ষেত্রেই অবস্থান করছি, আর এই পরীক্ষা চলছে প্রতিনিয়ত। বুখারী শরীফের হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে তোমরা অল্পই হাসতে এবং অধিক ক্রন্দন করতে।" কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রতি তা নাযিল করেছেন, যা তিনি আমাদের প্রতি করেননি, যেহেতু তাঁকে এই বাণী বহন করার গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়েছে, যা করার কারণে তিনি সে সময়ের মুশরিকদের শত্রুতার বোঝা কাঁধে নিয়েছেন, যারা তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে হত্যা করার, ঘর থেকে বের করে দেয়ার এবং ইসলামের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে - আর তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে আত্মিক শক্তি দান করার জন্য এমন কিছু বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁকে দিয়েছেন যা আমাদেরকে দেন নি - যেন তিনি এই জীবনের বাস্তব রূপ উপলব্ধি করতে পারেন। অবশ্য এই হাদীসের মানে এই নয় যে আমাদেরকে সবসময় বিমর্ষ থাকতে হবে এবং ভুরু কুঁচকে হাঁটাচলা করতে হবে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও হাসতেন, এমনকি তিনি কখনও কৌতুকও করতেন। কিন্তু এটা তার অভ্যাস ছিল না। যেমন কিছু মানুষ আছে প্রতি কথার সাথেই হাসতে থাকে যা অত্যন্ত ক্ষতিকর, যারা প্রতিটি বিষয়েই কৌতুক বোধ করে, তাদের নিকট গোটা জীবনটাই একটা বিরাট কৌতুকে পরিণত হয়, ফলে জীবনের প্রতিনিয়ত পরীক্ষার ব্যাপারে যে সচেতনতা থাকা দরকার তা তারা হারিয়ে ফেলে।*

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত - ৬: **"লা তারাউন্নাল জাহিম।"** *অর্থ:* **"তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে।"** *আমরা প্রত্যেকেই জাহান্নামের আগুন প্রত্যক্ষ করব, এই জীবনে নয়, মৃত্যুর পরের জীবনে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা মারইয়ামে উল্লেখ করছেন:*

"তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, যাকে এর (জাহান্নামের আগুনের) নিকটে আনা হবে না..." (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৭১)

বুখারী শরীফের হাদীসের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন কাউকে ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে না যতক্ষণ না তাকে জাহান্নামে তার স্থানটি দেখানো হয়, যেখানে তাকে নিক্ষেপ করা হত যদি সে অবিশ্বাস করত, যেন সে অধিকতর কৃতজ্ঞ হয়। তেমনি কাউকে ততক্ষণ জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে না, যতক্ষণ না তাকে জান্নাতের ঐ স্থানটি দেখানো হয়, যা সে বিশ্বাসী হলে লাভ করতে পারত, যেন সে অধিকতর শোকাচ্ছন্ন ও বিমর্ষ হয়। অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেন জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি সেতু স্থাপন করা হবে। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সেতুটি কি?' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: এটি পিচ্ছিল এবং এতে সাঁড়াশি রয়েছে। বিশ্বাসীদের মধ্যে একদল চোখের পলকে তা পার হয়ে যাবে। অন্যদল বিদ্যুত গতিতে পার হবে। কেউ ঝড়ো বাতাসের গতিতে। কেউ দ্রুতগামী অশ্বের গতিতে, কেউ উটের গতিতে। কেউ কোন ক্ষতি ছাড়াই এটা পার হবে। অন্যদের কিছু আঁচড় লাগবে। আর কেউ কেউ জাহান্নামে পড়ে যাবে। শেষ যে ব্যক্তি এই সেতু অতিক্রম করবে, সে এমনভাবে এটা পার হবে যেন তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এর নাম সীরাত।

<u>সূরা আত তাকাসুর, আয়াত - ৭:</u> **"সুম্মা লাতারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকীন।"** *অর্থ:* **"অতঃপর নিশ্চয়ই তোমরা একে (জাহান্নাম) স্বচক্ষে দেখবে।"** *মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে আমরা একে স্বচক্ষে দেখতে পারব, এ জীবনে আমরা একে দেখতে পাই নবীদের (আ) বর্ণনায় অংকিত চিত্রানুযায়ী। তাঁরা কিতাব ও ওহী অনুযায়ী জাহান্নামের বর্ণনা আমাদের সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে আমরা একে নিশ্চিতভাবে দেখব: "আইনুল ইয়াকীন"। রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যাখ্যা করেছেন, মুমিনগণ যখন জাহান্নামের আগুন দেখবে, তারা তা দেখে উৎফুল্ল হবে, কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে এ থেকে বাঁচিয়েছেন, তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়বে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের এ দৃশ্য দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের কষ্ট বৃদ্ধি করা, এ দৃশ্য দেখে তারা চরম দুঃখ, ক্ষোভ (নিজেদের মূর্খতার কারণে), হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, একথা উপলব্ধি করে যে তাদেরকে এখানে থাকতে হবে চিরকাল!*

<u>সূরা আত তাকাসুর, আয়াত - ৮:</u> **"সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন আনইন্নাইম।"** *অর্থ:* **"অতঃপর সেদিন তোমরা অবশ্যই (পার্থিব) আনন্দ-উপভোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"** *আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই পৃথিবীতে আমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন, তা সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হব। কেননা যেমনটি আগে বর্ণনা করা হয়েছে, এই জীবনে আল্লাহ পাক আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তার সবই পরীক্ষা। আমাদের সম্পদ পরীক্ষার বিষয়, আমরা রিক্ত হস্তে পৃথিবীতে এসেছি এবং কপর্দকহীন অবস্থায় এখান থেকে বিদায় নেব। এই সম্পদ পৃথিবীতে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে আমানত হিসেবে। যদি আমরা একে আল্লাহর পছন্দনীয় পথে ব্যয় করি, তাহলে এর কল্যাণ আমাদের সাথে রয়ে যাবে, যদি আমরা একে অন্যায় পথে ব্যয় করি, তবে এর পাপ আমাদেরকে গ্রাস করতে আসবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন তিনটি জিনিস একজন মৃত ব্যক্তিকে কবর পর্যন্ত অনুসরণ করে, দুটি ফিরে আসে, একটি থেকে যায়। তার আত্মীয়, তার সম্পদ এবং তার আমল তাকে কবর পর্যন্ত অনুসরণ করে, তার আত্মীয় এবং সম্পদ ফিরে আসে, আর তার আমল তার সাথে থেকে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন, দুটি নিয়ামত রয়েছে যা সম্পর্কে মানুষ প্রতারিত হয়, সুস্বাস্থ্য এবং অবসর। মানুষ এর দ্বারা প্রতারিত হয় এই ভেবে যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এ দুটি অনুগ্রহ আমাদের সাথে সর্বদা থাকবে। কিন্তু আমরা সহজেই এগুলো হারাতে পারি, এবং যখন আমরা দুর্বল কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ি, আমাদের অবসর সময় শেষ হয়ে আসে, তখন আমরা ইচ্ছা থাকলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত করতে পারি না, এবং তখন আমাদের আপসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন "ফা ইযা ফারগতা, ফানসাব।" ভাবার্থ:*

"যখন তুমি (নিয়মিত ইবাদতের) ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হও, অন্য ইবাদতে লেগে যাও।" (সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:৭)

আমাদের জীবন প্রকৃতপক্ষে ইবাদতের এক অবিরাম প্রক্রিয়া।

"...নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার ত্যাগ, আমার জীবন-মরণ, জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।"(সূরা আল আনআম, ৬:১৬২)

আমাদের গোটা জীবনই আল্লাহর জন্য হতে হবে, এই পার্থিব জীবনে আমাদের কোন ছুটি নেই। সৎকর্ম থেকে কিংবা ইসলাম থেকে আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ছুটি নিতে পারব না। ইসলাম শ্বাস-প্রশ্বাস কিংবা খাদ্যগ্রহণের মতই এক অবিরাম প্রক্রিয়া, এ থেকে এক মুহূর্তও বিরত থাকার উপায় নেই, ইসলাম যেন আমাদের একটি অংশ। আমরা যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া একটি মুহূর্তও টিকতে পারি না, তেমনি একজন বান্দা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণের অবস্থা ছাড়া একটি মুহূর্ত থাকতে পারে না। যদি আমরা ইসলাম থেকে সাময়িক ছুটি নেই, তবে বুঝতে হবে আমার ইসলাম নিছক কিছু আচার অনুষ্ঠান, প্রকৃত ইসলাম নয়। যেমন আমাদের সমাজে দেখা যায় "রামাদান মুসলিম", যারা কেবল রামাদান মাসে নামায পড়ে, অন্যদের চেয়ে বেশী পরিমাণেই পড়ে, কিন্তু রামাদান শেষ হলে সে এগার মাসের জন্য ইসলাম থেকে ছুটি নেয়, সে মনে করে যে পরবর্তী রামাদানে সে তার সমস্ত ইবাদত পূর্ণ করে নেবে - প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলাম নয়। আরও দেখা যায় "জুম্মাবারের মুসলিম", যে কোন নামায পড়ে না, কেবল জুমআর নামাযে হাজির হয়, সপ্তাহের বাকী সময় সে ইসলাম থেকে ছুটি কাটায়। এধরনের লোকেরা ভীষণ ক্ষতি ও ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। এমন জুম্মার নামায আল্লাহর নিকট মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা যদি আমাদের জীবনে নিয়মিত সালাত প্রতিষ্ঠা না করি, তাহলে হঠাৎ করে একদিন কিংবা বছরে একটি মাস আমাদের পক্ষে কিছুতেই একনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে সালাতকে আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশের মত প্রতিষ্ঠা করা চাই, এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে

'নামায পড়' এ আদেশ দেননি, তিনি আদেশ দিয়েছেন 'সালাত প্রতিষ্ঠা কর।' - পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমাদের জীবনের মৌলিক কাঠামো।

তাই আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদেরকে এ কথাগুলো চিন্তা করতে হবে। কুরআনের ১০২ নং সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আহবান জানিয়েছেন আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করার। মুমিন হিসেবে আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত করা। আল্লাহ পাক বলেন:

"আমি জ্বিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করা ছাড়া আর কোন কারণে সৃষ্টি করিনি।"(সূরা আয যারিয়াত, ৫১:৫৬)

- কুরআনের এই আয়াতে আমাদের জীবনের লক্ষ্য সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। তাই আমাদের এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। সেইসাথে আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ইবাদত এ কারণে নয় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আমাদের ইবাদতের কোন প্রয়োজন রয়েছে, বরং তাঁকে আমাদের ইবাদত করতে হবে শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদেই। আমাদের ইবাদত করতে হবে সেই অবস্থান অর্জনের জন্য, যে অবস্থানে উন্নীত হওয়ার জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জান্নাতে কেবল এই অবস্থানে উন্নীত ব্যক্তিরাই প্রবেশ করতে পারবে। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেছেন, লোকদেরকে জানিয়ে দাও, কেবল প্রকৃত বিশ্বাসীরাই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। তাই আসুন আমরা জীবন নিয়ে চিন্তা করি, জীবন নিয়ে আমাদের পরিতৃপ্তির অভাবের কারণ নিয়ে চিন্তা করি, এই অতৃপ্তির উৎস কোথায়? এর উৎস হচ্ছে জীবনের সঠিক লক্ষ্যের ওপর আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হওয়া। শয়তান আমাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে জীবনের বিভিন্ন আকর্ষণের ফাঁদে আটকে ফেলেছে, এগুলো হয়ত আমাদের পার্থিব জীবনকে কিছুটা আনন্দদায়ক করবে, কিন্তু এগুলো জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, আর এ অবস্থাতেই আমাদের স্ত্রী-সন্তানেরা পর্যন্ত আমাদের শত্রুতে পরিণত হয়, আমাদের অজান্তেই। আস সালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

---*সমাপ্ত*---

**[আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস ১৯৪৭ সালে জ্যামাইকায় একটি খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কানাডায় বড় হন। ষাটের দশকের শেষ দিকে ভ্যানকুভারে সাইমন ফ্রেসার ইউনির্ভাসিটিতে পড়া অবস্থায় সেখানকার বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করেন। ধীরে ধীরে তাঁর কম্যুনিজমের প্রতি আগ্রহ জন্মায় এবং তিনি কম্যুনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করেন। তিনি একবছর স্যান ফ্রান্সিস্কোতে কম্যুন্সিট পার্টির সাথে কাজ করার পর এই দলের কর্মকান্ডের আসল রূপ দেখতে পেয়ে পুনরায় কানাডায় ফিরে আসেন। কম্যুনিস্ট দর্শন তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারছিল না, এ দর্শন সমাজকে পরিবর্তনের কথা বললেও পরিবর্তন আনার মত বাস্তবধর্মী হাতিয়ার এর ছিল না, তাছাড়া কম্যুনিস্ট দর্শন প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল ব্যর্থ, আর শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থের নামে পরিচালিত গণ নির্যাতনকে তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তাছাড়া বহু বামপন্থী নেতাই ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত অসৎ ও অনৈতিক। অবশেষে তিনি কম্যুনিজম ত্যাগ করেন এবং হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম ও দর্শন পরখ করে দেখেন। ১৯৭১ সালে তাঁর এক কম্যুনিস্ট বন্ধু ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে ইসলামই মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ সমাধান উপস্থাপন করে, এতে রয়েছে সমাজবাদী এবং পুঁজিবাদী দর্শনের ভাল দিকগুলোর সমন্বয়। ছয়মাসের পড়াশুনা এবং আলোচনা-পর্যালোচনার পর তিনি ১৯৭২ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এর একবছর পর তিনি মদীনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি মদীনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উসুল আল দ্বীন অনুষদ থেকে আরবী ভাষায় ডিপ্লোমা এবং বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইসলামিক থিওলজি' তে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। একই বিষয়ের ওপর তিনি ১৯৯৪ সালে ডক্টরেট ডিগ্রী নেন ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলস এর ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ থেকে। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ও এর ঠিক পরপর তিনি তাঁর কয়েকজন সঙ্গী সহ সৌদি আরবে অবস্থিত মার্কিন বাহিনীর কাছে ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষাকে উপস্থাপন করার এক প্রোজেক্ট হাতে নেন, মার্কিন সেনাদের মাঝে বিদ্যমান ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করা ছিল তাঁদের এই প্রোজেক্টের লক্ষ্য। তাঁদের এই প্রচেষ্টায় তিন হাজারের ওপর মার্কিন সেনা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯৪ সাল থেকে তিনি আরব আমিরাতে বসবাসরত ছিলেন। সেখানে থেকে তিনি অধ্যাপনা, প্রকাশনা, খুতবা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষাকে প্রচারের কাজ করে আসছিলেন। অল্প কিছুদিন আগে ইসলামের বাণী প্রচারে তাঁর স্পষ্টবাদিতার কারণে তাঁকে আরব আমিরাত ত্যাগ করতে হয়। উল্লেখ্য যে তাঁর ৩০টিরও বেশী প্রকাশনা রয়েছে এবং তিনি সারজাহতে দার আল ফাতাহ প্রেস, দুবাইতে ডিসকভার ইসলাম নামক ইসলাম প্রচার কেন্দ্র, সারজাহ টিভি চ্যানেল-২, স্যাটেলাইট (ইসলামী চ্যানেল), আজমান টিভি চ্যানেল-৪ এবং সৌদি টিভি চ্যানেল-২ এর সাথে ইসলাম প্রচারের কাজে জড়িত ছিলেন। তিনি বর্তমান বিশ্বের নামকরা ইসলামী পন্ডিত এবং চিন্তাবিদদের অন্যতম।]*